বাংলা ব্যাকরণ: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

-ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ভাষা

মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত কতগুলো ধ্বনি যা মনের ভাব প্রকাশ করে, সেগুলোর সমষ্টিই ভাষা। অন্যকথায়, ভাষা কতগুলো অর্থযুক্ত ধ্বনির সমষ্টি মাত্র।

বাংলা ভাষার রূপ দু'টি: (ক) সাধু ভাষা ও (খ) কথ্য বা চলিত ভাষা।

সাধু ভাষা

একে এককালে 'পণ্ডিতী' ভাষা বলা হতো। একমাত্র সাহিত্যিক ভাষা হিসাবে এ'টি ব্যবহৃত হতে পারে। এর কোন কথ্য রূপ নেই। এ ভাষা পরিবর্তনশীলও নয়। সাধু ভাষাকে আগের যুগে কিতাবী ভাষা বলা হতো। কিন্তু এ যুগে লেখালেখিতে সাধু ভাষার ব্যবহার খুব অল্পই দেখা যায়।

বলা হয়ে থাকে: ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের কাঠামো অনুসরণ করে সাধু ভাষার রীতি-নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। পরে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সাধু ভাষার প্রভুত উন্নতি সাধন করেন।

চলিত ভাষা

আমরা যে ভাষায় কথা বলি, চলিত ভাষা তারই একটা পরিমার্জিত রূপ। বলা হয়: প্রমথ চৌধুরী সর্বপ্রথম চলিত ভাষার রীতি-নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের হাতে চলিত ভাষার রীতি সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য: (ক) চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল। (খ) মানুষের ভাব প্রকাশে এ'টি অপেক্ষাকৃত বেশি উপযোগী। (গ) নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় এ ভাষার ব্যবহার খুব উপযোগী ও শক্তিশালী।

সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য

(ক) সর্বনাম রীতিতে পার্থক্য: সাধু ভাষায় লিখা হয়: তাহার, তাহাদের, যাহার, যাহাদের ইত্যাদি। চলিত ভাষায় লিখা হয়: তার, তাদের, যার, যাদের ইত্যাদি।

(খ) ক্রিয়াপদ ব্যবহারে পার্থক্য: সাধু ভাষায় লিখা হয়: করিয়াছি, করিয়াছ, করিয়াছে, করিতেছে, করিতেছ, করিব, করিবে। চলিত ভাষায় এগুলো হবে: করেছি, করেছ, করেছে, করছে, করছ, করব, করবে ইত্যাদি।

(গ) সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য বেশি। অপরদিকে চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রাধান্য দেখা যায়।

(ঘ) সাধু ভাষায় অব্যয়গুলোর ব্যবহার অবিকৃত থাকে; চলিত ভাষায় পরিবর্তিত রূপের ব্যবহার বেশি। যেমন: যদ্যপি - যদি, তথাপি - তবু ইত্যাদি।

(ঙ) সাধু ভাষার কিছু কিছু ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম চলিত ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে।

যেমন: সাধু রীতি: জুতা পায়ে দিয়া এই পথে পথ চলা সহজ। চলিত রীতি: জুতো পায়ে দিয়ে এ পথে পথ চলা সহজ।

ব্যাকরণ

ভাষার যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ইত্যাদির বিধি বিধানের নাম ব্যাকরণ। বাংলা ব্যাকরণের মূল অংশ চারটি: (ক) বর্ণ ও ধ্বনি প্রকরণ, (খ) পদ ও শব্দ প্রকরণ, (গ) বাক্য প্রকরণ এবং (ঘ) ছন্দ ও অলঙ্কার প্রকরণ।

আলোচ্য বিষয়

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় মোট তিনটি: (১) ধ্বনিতত্ত্ব, (২) শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব এবং (৩) বাক্যতত্ত্ব।

১। ধ্বনিতত্ত্ব: সাধারণত ধ্বনি বলতে আমরা বুঝি কণ্ঠধ্বনির সূক্ষ্মতম মৌলিক অংশ বা একক। ধ্বনির সাংকেতিক চিহ্নকে বলে বর্ণ। ধ্বনিতত্ত্বে আলোচিত হয় ধ্বনি-বর্ণ ও বর্ণ গণন ইত্যাদি।

২। শব্দতত্ত্ব: এক বা একাধিক অর্থযুক্ত ধ্বনির মিলনে তৈরি হয় শব্দ। শব্দই ভাষার রূপ বা প্রতীক। শব্দতত্ত্বে আলোচিত হয় শব্দ-শব্দ গঠন ও পদ-প্রকরণ ইত্যাদি।

৩। বাক্যতত্ত্ব: বাক্য ভাষার পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক বিশেষ অংশ। এর সঠিক গঠন, সংযোজন, বিশ্লেষণ ও সার্থক ব্যবহার বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

আমরা এ প্রসঙ্গে ধ্বনিতত্ত্বের উপর আলোচনা করবো না। লেখালেখির ক্ষেত্রে বেশি জরুরী বিষয় দু'টো হলো শব্দতত্ত্ব বা শব্দ প্রকরণ এবং বাক্যতত্ত্ব। এ দু'টো বিষয়ের উপর নিচে কিছুটা আলোকপাত করছি।

শব্দ প্রকরণ

বিশিষ্ট ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে শব্দ বলে। যেমন: বাড়ি, গাড়ি, আবদুল্লাহ, রাস্তা ইত্যাদি। শব্দের অর্থ আছে। যেমন: বাড়ি - থাকার বাসস্থান, গাড়ি - একটি যানবাহন, আবদুল্লাহ - ব্যক্তির নাম এবং রাস্তা - পথ। আমরা অনেক ধ্বনি উচ্চারণ করতে পারি যার কোন বিশেষ অর্থ নেই। যেমন: গমর, গকাজ, বনথ, সকপ ইত্যাদি। এগুলোর কোনো অর্থ না থাকায় এগুলো শব্দও নয়।

বাংলা শব্দের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলা শব্দ সম্ভারকে মূলত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) তৎসম, (খ) তদ্ভব, (গ) অর্ধতৎসম, (ঘ) দেশি ও (ঙ) বিদেশি শব্দ।

(ক) তৎসম শব্দ: তৎ = সংস্কৃত, সম = সমান। সুতরাং তৎসম অর্থ সংস্কৃতের সমান। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত থেকে অবিকৃতভাবে অনেক শব্দ স্থান পেয়েছে। ওগুলোই হলো তৎসম শব্দ। দৃষ্টান্ত: প্রথম, দিবস, হস্ত, চক্ষু, কর্ণ, অন্ন, বস্ত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, গৃহ, ঘৃত, সর্প, চন্দ্র, সূর্য, সন্ধ্যা, রাত্রি, অরণ্য, বায়ু, আকাশ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, হস্তী, সমুদ্র, কাষ্ঠ ইত্যাদি।

(খ) তদ্ভব শব্দ: তৎ = সংস্কৃত, ভব = জাত। সুতরাং তদ্ভব অর্থ সংস্কৃত থেকে জাত। যেসব সংস্কৃত শব্দ প্রাকৃত ভাষার ভেতর দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় নিজস্ব শব্দে পরিণত হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। যেমন: অদ্য (সংস্কৃত) - অজ্জ (প্রাকৃত) - আজ (তদ্ভব বাংলা); হস্ত (সংস্কৃত) - হত্থ (প্রাকৃত) - হাত (তদ্ভব বাংলা); চন্দ্র (সংস্কৃত) - চন্দ (প্রাকৃত) - চাঁদ (তদ্ভব বাংলা); বৎস (সংস্কৃত) - বচ্ছ (প্রাকৃত) - বাছা (তদ্ভব বাংলা); কাষ্ঠ (সংস্কৃত) - কাট্‌ঠ (প্রাকৃত) - কাঠ (তদ্ভব বাংলা)।

(গ) অর্ধতৎসম শব্দ: যেসব সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের উচ্চারণ ও বানান বাংলা ভাষায় বিকৃত রূপ ধারণ করেছে, তাদের বলা হয় অর্ধতৎসম বা ভগ্ন তৎসম শব্দ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন: পুত্র - পুত্তুর, শ্রাদ্ধ - ছেরাদ্দ, নিমন্ত্রণ - নেমন্তন্ন, পুরোহিত - পুরুত, প্রাণ - পরাণ, প্রীতি - পিরিতি, শ্রী - ছিরি, গৃহিণী - গিন্নী, ঘৃণা - ঘেন্না, গ্রাম - গেরাম, বিশ্রী - বিচ্ছিরি ইত্যাদি।

(ঘ) দেশি শব্দ: বাংলার আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত অনার্য, কোল, ভীল, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা থেকে বংলায় যে সব শব্দ গৃহীত হয়েছে এবং যে সব শব্দের মূল (ধাতু বা প্রত্যয়) নির্ধারণ করা যায় না, সেগুলোকে দেশি শব্দ বলে। যেমন: কাঁচি, চাউল, কুলো, ঝাঁটা, মঠ, গড়, কলা, লাঠি, বাদুড়, ঘোমটা, গাড়ি, ডাব, কাতলা, চিংড়ি, ঘুড়ি, কয়লা, ডাগর, লেপ, কুড়াল ইত্যাদি।

(ঙ) বাংলা ভারতের দীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিদেশি জাতির আগমন ঘটেছে। এসব জাতির মধ্যে আরব, ফারসি, তুর্কি, ইংরেজ, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, দিনেমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বহুকাল এদেশে মুসলমানদের রাজত্বও কায়েম ছিলো। ফলে আরবি, ফারসি, তুর্কি, পর্তুগিজ, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষার অনেক শব্দ বাংলায় অনুপ্রবেশ করেছে। এগুলোকে বিদেশি শব্দ বলা হয়। কয়েকটি বিদেশি শব্দ দেখুন: আলখাল্লা, দারোগা, চাকু, লাশ, বেগম, বাহাদুর, কুলি, বিবি, বোচকা, সওগাত ইত্যাদি । এগুলো সবই তুর্কি ভাষা থেকে এসেছে। কুরআন, কিতাব, আতর, আক্কেল, কেচ্ছা, হুকা, মসজিদ, মসনদ, কয়েদ, কড়ার, ইলম, এজাহার, উকিল, কসাই, সাদি, হিসাব, বিদায়, মুনাফা, খাজনা, মশাল, মামলা, ইমারত, মাশুল, ফসল, আদালত, ওয়ারিশ, কবুল, কলম, গোলাম, তামাসা ইত্যাদি। এগুলো সবই আরবি থেকে এসেছে। এভাবে প্রচুর ইংরেজি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। বেশকিছু পর্তুগিজ শব্দও বাংলায় অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন: সাগু, আলমারি, আলপিন, কেরানি, জানালা, সাবান, তোয়ালে, ফিতা, গামলা, বালতি, পেরেক, পাউরুটি, বোতল, পেয়ারা, আতা, পেঁপে, আলকাতরা, আয়া, কামিজ, বোতাম, বারান্দা ইত্যাদি।

সন্ধি

পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের বা শব্দের মিলনকে সন্ধি বলে। সন্ধি মূলত দু'রকমের: ১. স্বর সন্ধি ও ২. ব্যঞ্জন সন্ধি।

১. স্বর সন্ধি: স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বর সন্ধি বলে। উদাহরণ: জল + আশয় = জলাশয়; নর + অধম = নরাধম; গ্রন্থ + আগার = গ্রন্থাগার; বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; মহা + আশয় = মহাশয়। রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র; পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা; অতি + ইত = অতীত; প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা; কটু + উক্তি = কটূক্তি; মরু + উদ্যান = মরুদ্যান; শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা; স্ব + ইচ্ছা = স্বেচ্ছা; যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা, যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট; শ্রবণ + ইন্দ্রিয় =

শ্রবণেন্দ্রিয়; সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়; হিত + উপদেশ = হিতোপদেশ; পর + উপকার = পরোপকার; মহা + উৎসব = মহোৎসব; যথা + উচিৎ = যথোচিত; মত + ঐক্য = মতৈক্য; জন + এক = জনৈক; তথা + এব = তথৈব; হিত + ঐষী = হিতৈষী; শীত + ঋত = শীতার্ত; ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত; তৃষ্ণা + ঋত = তৃষ্ণার্ত; বন + ঔষধ = বনৌষধ; মহা + ঔষধি = মহৌষধি; অতি + অন্ত = অত্যন্ত; প্রতি + অহ = প্রত্যহ; ইতি + আদি = ইত্যাদি; প্রতি + এক = প্রত্যেক; প্রতি + ঊষ = প্রত্যুষ; অনু + এষণ = অন্বেষণ; অনু + অয় = অন্বয়; পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়; মাত্র + আলয় = মাত্রালয়; শে + অয়ন = শয়ন; পো + অন = পবন; নে + অন = নয়ন; গো + এষণা = গবেষণা; গৈ + এক = গায়ক; নৌ + ইক = নাবিক; পো + ইত্র = পবিত্র।

১. ব্যঞ্জন সন্ধি: ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণ কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ মিলিত হয়ে যে সন্ধি হয়, তাকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলে। উদাহরণ: দিক্ + অন্ত = দিগন্ত; পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ; চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র; উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল; তদ্ + টীকা = তট্টীকা; উৎ + ডয়ন = উড্ডয়ন; উৎ + লাস = উল্লাস; উৎ + লেখ = উল্লেখ; উৎ + হার = উদ্ধার; উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস; উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল; কৃষ + তি = কৃষ্টি; দৃষ + তি = দৃষ্টি; উৎ + নতি = উন্নতি; সম + গীত = সঙ্গীত; সম + কট = সঙ্কট; সম্ + বাদ = সংবাদ; সম্ + শয় = সংশয়; সম্ + কৃত = সংস্কৃত; সম্ + করণ = সংস্করণ; সম্ + কার = সংস্কার; উৎ + স্থান = উত্থান; উৎ + স্থাপন = উত্থাপন; বাক্ + ময় = বাঙ্ময়; তৎ + মাত্র = তন্মাত্র; হৃদ্ + কমল = হৃৎকমল; ক্ষুধ্ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা; বিপদ্ + পাত = বিপৎপাত; বিপদ + সঙ্কুল = বিপৎসঙ্কুল ইত্যাদি।

পদ

শব্দ যখন বিভক্তিযুক্ত তখন তাকে পদ বলা হয়। বিভক্তিযুক্ত শব্দকে বলা হয় নামপদ আর বিভক্তিযুক্ত ধাতুকে বলা হয় ক্রিয়াপদ। উদাহরণ: শব্দ বিভক্তি - শিশু + রা - শিশুরা (নামপদ); ধাতু বিভক্তি - হাস্ + এ - হাসে (ক্রিয়াপদ)।
পদের প্রকার: পদ মূলত দু'রকমের: নামপদ ও ক্রিয়াপদ।
নামপদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও অব্যয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি পদ মোট পঁচাটি: (১) বিশেষ্য, (২) বিশেষণ, (৩) সর্বনাম, (৪) অব্যয় ও (৫) ক্রিয়াপদ।

বিশেষ্য পদ

কোনো কিছুর নামকে বিশেষ্য পদ বলে। বিশেষ্য পদের ৮টি শ্রেণি আছে। যথা: (১) সংজ্ঞাবাচক, (২) জাতিবাচক, (৩) বস্তুবাচক, (৪) সমষ্টিবাচক, (৫) গুণবাচক, (৬) ভাববাচক, (৭) অবস্থাবাচক ও (৮) ক্রিয়াবাচক।
(১) ব্যক্তি বা স্থানের নামকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: 'আবদুল্লাহ', 'অরুণ', 'ঢাকা', 'সিলেট' ইত্যাদি।
(২) বস্তু বা প্রাণীর নাম না বুঝিয়ে সে জাতীয় সমস্ত বস্তু বা প্রাণীর নাম বুঝায় এমন বিশেষ্য পদকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: 'মানুষ', 'পশু', 'কুকুর' ইত্যাদি।
(৩) বস্তুর নাম প্রকাশ করে এরূপ পদকে বস্তুবাচক পদ বলে। যেমন: 'লোহা', 'ইস্পাত' ইত্যাদি।
(৪) দল গোষ্ঠি বা সমষ্টির নাম বুঝায় এমন বিশেষ্য পদকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: 'সভা', 'সমিতি' ইত্যাদি।
(৫) কোন কিছুর গুণ বুঝায় এমন বিশেষ্য পদকে গুণবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: 'দয়া', 'মায়া', 'মমতা' ইত্যাদি।
(৬) ভাবের নাম বুঝায় এমন বিশেষ্য পদকে ভাববাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: 'বাবুগিরি', 'মনুষ্যত্ব', 'স্বাধীনতা', 'পরাধীনতা' ইত্যাদি।
(৭) যে বিশেষ্য পদ কোন অবস্থার নাম বুঝায় তাকে অবস্থাবাচক বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: 'সুখ', 'দুঃখ', 'শান্তি', 'অশান্তি'।
(৮) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ সেটি যার দ্বারা ক্রিয়া বা কাজের নাম প্রকাশ করে। যেমন: 'যাওয়া', 'খাওয়া', 'গাওয়া'।
দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত গুণবাচক, ভাববাচক এবং অবস্থাবাচক বিশেষ্য প্রকৃতপক্ষে ভাববাচক বিশেষ্য বর্গেরই অন্তর্ভূক্ত।

বিশেষণ পদ

যা অন্য কিছুকে বিশিষ্টতা দান করে তার নামই বিশেষণ। বাস্তবে, যে পদ বিশেষ্য বা অন্য কোন পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা বা পরিমাণ ইত্যাদি বুঝায় তাকে বিশেষণ পদ বলে। একটা দৃষ্টান্ত দেখি: জসিম ছাত্র হিসাবে মেধাবী কিন্তু সে অতি অলস। তাই পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করতে পারে নি। এখানে 'মেধাবী' ছাত্র বিশেষণের গুণ, 'অলস' সর্বনামের দোষ এবং 'প্রথম' স্থান বিশেষ্যের অবস্থা প্রকাশ করেছে। সুতরাং মেধাবী, অলস ও প্রথম এ তিনটি পদই বিশেষণ পদ। কয়েকটি বাক্য দেখুন:
(১) নীল আকাশে কে ভাসাল সাদা মেঘের ভেলা। [এখানে 'নীল' হলো আকাশ বিশেষ্যের বিশেষণ এবং 'সাদা' হলো মেঘ বিশেষ্যের বিশেষণ।]

(২) এসেছে বরষা বড় চঞ্চল বড় দুরন্ত মেয়ে। [এখানে 'বড়' -এ বিশেষণ পদটি কতটা 'চঞ্চল' এবং কতটা 'দুরন্ত' তা প্রকাশ করেছে।]
(৩) সেই তুমি আজ টাকার কাঙাল হয়েছ। [এখানে 'সেই' পদটি 'তুমি' সর্বনামকে বিশেষিত করেছে।]

আরো কিছু বাক্যে বিশেষণ পদের ব্যবহার দেখুন:
(১) পরণে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর। [ঢাকাই] - একপদ বিশেষণ
(২) সুস্থ দেহ সবল মনই আমাদের কাম্য। [সুস্থ, সবল] - একপদ বিশেষণ
(৩) সিলেটের চা-বাগানে মৌ মৌ সুগন্ধি। [সিলেটের, মৌ মৌ] - যৌগিক বিশেষণ
(৪) তার ক্ষুরধার বুদ্ধি। [ক্ষুরধার] - যৌগিক বিশেষণ
(৫) মহারাণী কুসুম কোমল শয্যায় শয়ন করলেন। [কুসুম কোমল] - যৌগিক বিশেষণ
(৬) নাম না জানা ফুলের গন্ধে বনপথ ভরে উঠেছে। [নাম না জানা] - যৌগিক বিশেষণ
(৭) মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যাপাশে দাঁড়িয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। [ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে] - যৌগিক বিশেষণ
(৮) ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এ বসুন্ধরা। [ধন-ধান্যে পুষ্পে] - বহুপদ বিশেষণ
(১০) ঐ সুদর্শন ছেলেটিই কালাম সাহেবের ভাগ্নে। [সুদর্শন] - উদ্দেশ্য বিশেষণ
(১১) এমন মূল্যবান সময় বিনষ্ট করা উচিৎ নয়। [মূল্যবান] - উদ্দেশ্য বিশেষণ
(১২) মুসলিমা পড়াশুনায় ভালো। [ভালো] - উদ্দেশ্য বিশেষণ
(১৩) নদীস্রোত ছুটে চলছে তীব্র গতিতে। [তীব্র গতিতে] - উদ্দেশ্য বিশেষণ
(১৪) সালেহা পড়াশুনায় ভালো। [ভালো] - সর্বনাম পদ

সর্বনাম পদ

সব রকম নামের - অর্থাৎ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ ব্যবহৃত হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। বাক্যে একই বিশেষ্য পদ বার বার ব্যবহার করলে ভাষার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন ও ভাষা হয়ে ওঠে শ্রুতিকটু। পুনরুক্তিজনিত এই ত্রুটি দূর করার উপায় হলো বিশেষ্যের বদলে সর্বনাম পদের ব্যবহার। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন:
সালেহা বড় ভালো মেয়ে। সালেহা গুরুজনদের মেনে চলে। সালেহা কখনো গুরুজনদের অবাধ্য হয় না। এখানে 'সালেহা' ও 'গুরুজনদের' শব্দ দু'টি বার বার ব্যবহারে ভাষার মাধুর্য ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু যদি লিখা হয়: 'সালেহা বড় ভালো মেয়ে। সে গুরুজনদের মেনে চলে। কখনও তাঁদের অবাধ্য হয় না।' তাহলে বাক্যের সৌন্দর্য বেড়ে যায়।

সর্বনামের শ্রেণি

পুরুষবাচক সর্বনাম: উত্তম পুরুষ- আমি, আমরা, আমাদের; মধ্যম পুরুষ- তুমি, তোমরা, তোমাদের; প্রথম পুরুষ- সে, তারা, তাদের ইত্যাদি।
বাংলায় বিভিন্ন অর্থে পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে একটি হলো 'তুচ্ছার্থ'। এটা ব্যক্তিগতভাবে আমার অপছন্দনীয়। ভাষা থেকে তুচ্ছার্থের ব্যবহার তুলে নিলেই ভালো হয়! ইংরেজি, আরবি ইত্যাদি ভাষায় তুচ্ছার্থে সর্বনামের ব্যবহার দেখা যায় না। যাক, যে তিনটি অর্থে সর্বনাম কথ্য ও লিখিত ভাষায় ব্যবহার হচ্ছে তাহলো: সাধারণ অর্থে: তুমি, তোমরা। সম্মানার্থে: আপনি, আপনারা। তুচ্ছার্থে: তুই, তোরা। লক্ষ করুন, ইংরেজিতে দেশের মহারাণীকেও 'ইউ' এবং রাস্তার ঝাড়ুদারকেও 'ইউ' বলে সম্বোধন করা হয়। সম্মান দেখাতে যেয়েও 'ইওর ম্যাজেস্টি' বলা হয়। অনুরূপ আরবিতে 'আনতা', 'আনতুম' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাহলে বাংলায় এই 'ক্লাস' বিভক্তিমূলক সর্বনামগুলো থাকবে কেন? শুধু 'আপনি' ও 'আপনারা' থাকলে দোষ কিসের? হ্যাঁ 'তুমি' ও 'তোমরা' রাখা যায়। কিন্তু 'তুই' ও 'তোরা' -এ জাতীয় সর্বনাম বাংলা কথ্য ও লিখিত ভাষা থেকে সমূলে মুছে ফেললে উপকৃত হবে সমগ্র বাঙালি জাতি। দূর হবে মানুষ কর্তৃক মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যভাবে সম্বোধনের ঘৃণ্য রিওয়াজ।

অব্যয় পদ

কোন অবস্থাতেই যে পদের পরিবর্তন ঘটে না তাকে অব্যয় বলে। দেখুন কয়েকটি বাক্য: ১. দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? এখানে 'বিনা' অব্যয়। ২. সে দরিদ্র, কিন্তু উদারমনা। এখানে 'কিন্তু' অব্যয়। ৩. হায়! এ কী সর্বনাশ হল। এখানে 'হায়' অব্যয়। অব্যয়ের লিঙ্গ, বচন বা পুরুষ নেই।

অব্যয়ের শ্রেণি

অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বেশ মতভেদ আছে। ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন অনেকে। যেমন:

১. পদান্বয়ী অব্যয়।
২. বাক্যান্বয়ী বা সমুচ্চয়ী অব্যয়।
৩. অনন্বয়ী অব্যয়।

বাক্যান্বয়ী বা সমুচ্চয়ী এবং অনন্বয়ী অব্যয়ের উপবিভাগও আছে। যথা:
বাক্যান্বয়ী অব্যয়ের উপবিভাগসমূহ: (ক) সংযোজক, (খ) বিয়োজক, (গ) সঙ্কোচক, (ঘ) হেতুবাচক, (ঙ) সিদ্ধান্তবাচক ও (চ) নিত্যসম্বন্ধ।
অনন্বয়ী অব্যয়ের উপবিভাগসমূহ: (ক) ভাব প্রকাশক, (খ) প্রশ্নসূচক এবং (গ) সম্বোধনসূচক।

পদান্বয়ী অব্যয়: যেসব অব্যয় এক পদের সঙ্গে অন্য পদের সমন্বয় সাধন করে তা-ই পদান্বয়ী অব্যয়। যেমন: আমি মায়ের জন্য উপহার এনেছি। এখানে 'জন্য' পদান্বয়ী অব্যয়।

বাক্যান্বয়ী বা সমুচ্চয়ী অব্যয়: যেসব অব্যয় দুই বা ততোধিক বাক্য, বাক্যাংশ কিংবা পদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, তারা হলো বাক্যান্বয়ী বা সমুচ্চয়ী অব্যয়। এই অব্যয়ের উপরে উল্লেখিত ছ'টি উপবিভাগের উদাহরণ যথাক্রমে তুলে ধরছি।
(ক) সংযোজক অব্যয়সমূহ: এবং, ও, আর, কিন্তু ইত্যাদি। যেমন: সাপ আর নেউল পরস্পরের শত্রু।
(খ) বিয়োজক অব্যয়সমূহ: কিংবা, নতুবা, অথবা, নইলে ইত্যাদি। যেমন: পড়াশুনা কর নইলে পাশ করবে কি করে?
(গ) সঙ্কোচক অব্যয়সমূহ: বরং, অথচ, তথাপি ইত্যাদি। যেমন: অতিরিক্ত পরিশ্রমে লাভ নেই বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।
(ঘ) হেতুবাচক অব্যয়সমূহ: সুতরাং, কারণ, যেহেতু, কেননা ইত্যাদি। যেমন: সে আজ কাজে আসে নি কারণ তার জ্বর হয়েছে।
(ঙ) সিদ্ধান্তবাচক অব্যয়সমূহ: তাই, অতএব, এজন্য ইত্যাদি। যেমন: সে দোষি তাই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।
(চ) নিত্যসম্বন্ধ অব্যয়সমূহ: বরং, তবু, যদি, তথাপি, যেমন, তেমন ইত্যাদি জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হয়। যেমন: যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর।

অনন্বয়ী অব্যয়: বাক্যে ব্যবহৃত হয়েও যেসব অব্যয় সম্বন্ধযুক্ত নয় তারা হলো অনন্বয়ী অব্যয়। উপরে এই অব্যয়ের তিনটি উপবিভাগ উল্লেখিত হয়েছে। এগুলোর উদাহরণ যথাক্রমে তুলে ধরছি।
(ক) ভাব প্রকাশক: মনের আনন্দ, বেদনা, শোক, হর্ষ, প্রশংসা, বিস্ময় ইত্যাদি প্রকাশ করতে আমরা কিছু অব্যয় ব্যবহার করি। যেমন: ১. মরি মরি! কী অপরূপ সৌন্দর্যই না দৃষ্টিতে ভেসে এলো। [মরি - হর্ষ প্রকাশক] ২. হায়! আমার কী সর্বনাশ হলো। [হায় - শোক প্রকাশক] ৩. ছিঃ ছিঃ! তোমার মন এতো সঙ্কীর্ণ। [ছিঃ - ঘৃণা প্রকাশক] ৪. বাপুরে! সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য এখনও স্মৃতিপটে বার বার ভেসে আসছে। [বাপুরে - ভয় প্রকাশক]
(খ) প্রশ্নসূচক: প্রশ্ন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ১. তুমি বাড়ি যাবে ত? (ত) ২. সে আসবে কি? (কি) ৩. তুমি পড়বে না? (না)
(গ) সম্বোধনসূচক: এগুলো সূচনা করে থাকে। যেমন: ১. ওহে বালক! এবার বাড়ি চল। [ওহে] ২. ওরে কালু! হুঁকোটা নিয়ে আয়। [ওরে] ৩. হে পথিক! পথে অনেক কাটা। সতর্কতাসহ পদক্ষেপ করো। [হে]

কিছু অব্যয় আছে যাদের নিজস্ব অর্থ নেই। এগুলো বাক্যে অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন: ১. সে তো এলো না। [তো] ২. বলি, আজ কেনো ছুটি হল? [বলি]
কিছু অব্যয় আছে যা ধ্বনির অনুকরণে গঠিত হয়। যেমন: ১. রুনু ঝুনু নুপুর বাজে পায়। [রুনু ঝুনু] ২. এই চোখ ছল্ ছল্। [ছল্ ছল্]
কিছু অব্যয় আছে যার মাধ্যমে উপমার ভাব প্রকাশ করে। যেমন: ১. মেয়েটির রং যেনো দুধে আলতা। [যেন] ২. অমন কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করছ কেন? [মত]
কিছু অব্যয় আছে যা বিশ্লেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ১. অতি বাড় বেড়ো না'ক ঝড়ে ভেঙে যাবে। [অতি] ২. অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধুতে নিপুণ। [অতি]

ক্রিয়াপদ

যে পদ দিয়ে কোন কিছু করা, খাওয়া, যাওয়া প্রভৃতি কাজ বুঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ক্রিয়াপদের অংশ দু'টি: (ক) ধাতু ও (খ) বিভক্তি বা প্রত্যয়।

ক্রিয়ার মূল অংশের নাম ধাতু। আর ধাতুর সঙ্গে সংযুক্ত বাকি অংশ হলো বিভক্তি বা প্রত্যয়।

উদাহরণ: ১. দেখিয়া = দেখ (ধাতু) + ইয়া (প্রত্যয়)।

ধাতু মোট তিন রকমের : (ক) মৌলিক, (খ) সাধিত ও (গ) যৌগিক।

(ক) এমন ধাতু যা নিজেই সম্পন্ন হয়, তাকে মৌলিক ধাতু বলে। যেমন: আন, কর, চল, দেখি, বল, লিখ ইত্যাদি।

(খ) ধাতু বা নামপদের শেষে প্রত্যয় যোগ করে যেসব ধাতু সাধন হয়, ওগুলো সাধিত ধাতু। যেমন: কর্ + আ = করা; দে + খা = দেখা; ঘুম + আ = ঘুমা; ডর্ + আ = ডরা ইত্যাদি।

(গ) কর, হা, খা, যা, দে ইত্যাদি ধাতুর সঙ্গে বিশেষ্য বিশেষণাদি যোগে সংযোজকমূলক ধাতু গঠিত হয়। যেমন: ধার কর, পার কর, লাভ কর, উত্তর দে, টান দে, ঘুষ খা, ভোট দে, মার খা ইত্যাদি।

ক্রিয়ার প্রকারভেদ

১. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার সাহায্যে বাক্য সমাপ্ত হয় তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: আমি যাব। সে গিয়েছিল।

২. অসমাপিকা ক্রিয়া: ক্রিয়ার সাহায্যে বাক্য সমাপ্ত হয় না, অন্য ক্রিয়ার উপর নির্ভর করতে হয়, এমন ক্রিয়াকে বলে অসমাপিকা ক্রিয়া। যেমন: সে খেয়ে মাদ্রাসায় যাবে। ভোর হলে সে যাবে।

৩. সমকর্ম ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাকে সমকর্ম ক্রিয়া বলে। যথা: ছেলেরা বই পড়ছে। এখানে 'বই' পড়ছে ক্রিয়ার কর্ম।

৪. অকর্মক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কোন কর্ম নেই, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যথা: কাজল হাসছে। অপু লিখছে।

৫. দ্বিকর্মক ক্রিয়া: দু'টি কর্ম থাকে এমন ক্রিয়াকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন: শরীফ রহমতকে অঙ্ক কষাচ্ছেন। এখানে 'কষাচ্ছেন' ক্রিয়া এবং রহমতকে ও অঙ্ক হলো ক্রিয়ার কর্ম।

৬. গৌণ কর্ম ও মুখ্য কর্ম: সাধারণত ব্যক্তিবাচক কর্মকে গৌণ কর্ম ও বস্তুবাচক কর্মকে মুখ্য কর্ম বলে। যথা: মা ছেলেকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। এ বাক্যে 'ছেলেকে' গৌণ কর্ম ও 'চাঁদ' মুখ্য কর্ম।

৭. যৌগিক ক্রিয়া: সমাপিকা এবং অসমাপিকা ক্রিয়া যোগ বা মিশ্রিত হয়ে যে ক্রিয়াপদ তৈরি করে, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যথা: মুছে ফেল। কেটে ফেল। চলে যাও। বসে পড়। মেরে ফেল। ইত্যাদি। এখানে কেটে, চলে, বসে মরে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া এবং ফেলে, যাও, পড়, ফেল ইত্যাদি সমাপিকা ক্রিয়া।

৮. মিশ্র ক্রিয়া: বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, হ, দে, পা, যা ইত্যাদি ধাতুযোগে গঠিত ক্রিয়াপদ বিশেষ অর্থে মিশ্র ক্রিয়া গঠন করে থাকে। যেমন: কানে ঝিমঝিম করছে।

৯. প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া: কোন কাজ নিজে না করে অন্যকে দিয়ে করালে তাকে প্রযোজক বা ণিজন্ত ক্রিয়া বলে। যথা: হানিফ আজিজকে হাসাচ্ছে। কালু মণিকে কাঁদাচ্ছে।

লিঙ্গ

যে চিহ্ন বা লক্ষণ স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদির বোধ বোঝায় তাকে লিঙ্গ বলে। বাংলায় লিঙ্গ মোট ৪টি। এগুলো হলো: (ক) পুংলিঙ্গ (পুরুষ, ছাত্র, দেবর, কর্তা ইত্যাদি), (খ) স্ত্রীলিঙ্গ (নারী, ছাত্রী, ননদ, গিন্নী ইত্যাদি), (গ) ক্লীবলিঙ্গ (পত্র, পুষ্প, কাগজ, বই ইত্যাদি) ও (ঘ) উভয়লিঙ্গ (বন্ধু, শিশু, সন্তান ইত্যাদি)।

লিঙ্গ পরিবর্তন

বাংলায় লিঙ্গ পরিবর্তনের বিশেষ বিধি-বিধান আছে। সংস্কৃত পুংলিঙ্গ শব্দগুলোকে প্রধানত তিনটি উপায়ে পরিবর্তন করা হয়। যেমন:

১. স্ত্রী প্রত্যয় যোগ করে। ২. ভিন্ন শব্দ দিয়ে। ৩. স্ত্রীবোধক শব্দ যোগ করে।

উদাহরণ: আর্য - আর্যা; অনাথ - অনাথা; বালক - বালিকা; माननीয় - মাননীয়া; সভ্য - সভ্যা; শিষ্য - শিষ্যা; তনয় - তনয়া; কুমার - কুমারী; চপল - চপলা; প্রণত - প্রণতা; অগ্রজ - অগ্রজা; মানুষ - মানুষী; পৌত্র - পৌত্রী; নিশাচর - নিশাচরী; হরিণ - হরিণী; পিচাশ - পিচাশী; মধুকর - মধুকরী; বিদ্যাবান - বিদ্যাবতী; বিধাতা - বিধাত্রী; প্রণেতা - প্রণেত্রী; ওজস্বী - ওজস্বিনী; স্রোতস্বী - স্রোতস্বিনী; রাজা - রাজ্ঞী; ইন্দ্র - ইন্দ্রাণী; বন - বনানী; প্রকাশক - প্রকাশিকা; প্রেরক - প্রেরিকা; বিদূষক - বিদূষিকা; সাধক - সাধিকা; চন্দ্রবদন - চন্দ্রবদনা বা চন্দ্রবদনী; যুবক - যুবতী; ভাই - ভাবী; কবি - কবিপত্নী; মুনি - মুনিপত্নী; কথা - কথিকা; কোষা - কৃষি; অভাগা - অভাগী; বামুন - বামুনী; শ্বশুর - শাশুড়ী; বাঁদর - বাঁদরী; ডাহুক - ডাহুকী; তেলি - তেলিনী; জেলে - জেলেনী; বেয়াই - বেয়ান; খানসামা - আয়া; হুলোবিড়াল -

মেনীবিড়াল ইত্যাদি।

বচন
বাংলায় বচন মাত্র দু'টি: (ক) একবচন ও (খ) বহুবচন। একবচন থেকে বহুবচনের পরিবর্তনের জন্য আগে কিংবা পরে কিছু বহুবচন প্রকাশক শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন: গণ, জন, বৃন্দ, বর্গ, মণ্ডলী, পুঞ্জ, গুচ্ছ, মহল, সব, সকল, সমূহ, কুল, নিচয়, আবলী, নিকর, রাজি, দাম, মালা, রাশি, গ্রাম, রা, দের ইত্যাদি। দেখুন কিছু শব্দ:
ছেলেরা, গাছগুলো, ফলগুলো, আমাদের, তাদের, বালকরা, মেয়েরা, সুধীজন, সুধীবৃন্দ, গ্রন্থাবলী, বৃক্ষরাজি, কুসুমনিচয়। মনে রাখার বিষয় যে, একবচনের পূর্বে বহুত্ববাচক শব্দ থাকলে একবচন পরিবর্তিত হবে না। যেমন: বহু কথা, অনেক দিন, বিস্তর মাল, নানা আলাপ, ঢের কর্জ, সকল লোক, বড় বড় গাছ, ছোট ছোট পাখি, লাল লাল ফুল ইত্যাদি। বিশেষ্য পদের দ্বিত্ব ব্যবহারেও আমরা বহুবচন বোঝাতে পারি। যেমন: বনে বনে, ঘরে ঘরে, জনে জনে, ক্ষণে ক্ষণে, দিন দিন, বছর বছর ইত্যাদি।

বহুবচন প্রকাশক প্রত্যয়
আমরা অহরহ বহুবচন বানাতে যেয়ে প্রত্যয় যোগ করি। তবে সকল প্রত্যয় সকল ক্ষেত্রে যুক্ত হয় না। উন্নত প্রাণিবাচক, ইতর প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়যোগে বহুবচন হয়। নিচে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

(ক) রা, এরা, দিগ, দিগের, দের : এ প্রত্যয়গুলো উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন: ১. মানুষেরা, তারা, ছাত্ররা, বালকদিগদ্বারা, তাদিগের ইত্যাদি। ইতর প্রাণিবাচক কিংবা অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে এসব প্রত্যয় যুক্ত হয় না। যেমন: গাছেরা, গরুদিগের, কুকুরদের ইত্যাদি শুদ্ধ নয়। তবে অপ্রাণিবাচক বস্তুতে প্রাণ বা চেতনা কল্পনা করে সময় সময় এগুলো ব্যবহার করা যায়। যেমন: সারি সারি গাছেরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।
(খ) গুলি, গুলো, গুলা : এগুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক উভয় ধরনের শব্দে যুক্ত হয়ে বহুবচন প্রকাশ করতে পারে। যেমন: বালকগুলি, ফলগুলো। উচ্চশ্রেণির লোকের ক্ষেত্রে এগুলো যুক্ত হবে না। যেমন: বলা যাবে না- শিক্ষকগুলি, মুরুব্বিগুলো ইত্যাদি।
(গ) গণ, জন, বৃন্দ, বর্গ, মণ্ডলী, মহল : এ প্রত্যয়গুলো শুধুমাত্র উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন: জনগণ, বালকগণ, সুধীজন, সাধুজন, সুধীবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, মন্ত্রিবর্গ, পণ্ডিতবর্গ, সম্পাদকমণ্ডলী, অধ্যাপকমণ্ডলী, বন্ধুমহল, রাজনৈতিকমহল।
(ঙ) আবলী, নিকর, রাজি, দাম, মালা, রাশি, মণ্ডল, পুঞ্জ, গুচ্ছ, নিচয়: এই বহুবচন বোধক শব্দগুলো অপ্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যেমন; গ্রন্থাবলী, গুণাবলী, কুসুমনিকর, বৃক্ষরাজি, তারকারাজি , কুমুসদাম, তৃণদাম, পর্বতমালা, তরঙ্গমালা, বালুকারাশি, বায়ুমণ্ডল, মেঘমণ্ডল, মেঘপুঞ্জ, দ্বীপপুঞ্জ, পুষ্পগুচ্ছ, শব্দগুচ্ছ, পর্বতনিচয়, বস্তুনিচয় ইত্যাদি।

ক্রিয়ার পুরুষ
ক্রিয়ার পুরুষ তিনটি: (ক) উত্তম, (খ) মধ্যম ও (গ) প্রথম বা নাম। (ক) বাক্যে যিনি বক্তা তিনি উত্তম পুরুষ। যথা: আমি, আমরা ইত্যাদি। (খ) বক্তা যাকে উদ্দেশ্য করে বলেন সে বা তিনি মধ্যম পুরুষ। যথা: তুমি, তোমরা ইত্যাদি। (গ) মধ্যম পুরুষ ছাড়া বক্তা তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে সম্বোধন করে যখন উক্তি করেন, তখন তাকে প্রথম ও নামপুরুষ বলে। বলা যায় তুমি ও আমি ভিন্ন শব্দ মাত্রই প্রথম বা নাম পুরুষ। যেমন: সে, তিনি, তারা ইত্যাদি।

কারক
বাংলা বাক্যে মোট পাঁচটি পদের ব্যবহার দেখা যায়: বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া। প্রথম তিনটি তথা বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণকে একত্রে 'নাম পদ' বলে। বাক্যের মধ্যে কোন পদই খাপছাড়া নয়। পদগুলোর পরস্পরের মধ্যে কোন না কোন সম্বন্ধ থাকে। ব্যাকরণে এই সম্বন্ধ বলে অন্বয়।
বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে যে নাম পদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, তাকেই কারক বলে। এই বাক্যটি বিবেচনা করুন: আজিজের বাবাকে তিনি দেখেছেন। এখানে বিশেষ্য পদ 'বাবাকে' এবং সর্বনাম পদ 'তিনি' উভয় নাম পদের 'দেখেছেন' ক্রিয়া পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং উভয় পদই কারক।
১. কর্তৃকারক: যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে ক্রিয়ার কর্তাকে বোঝায়, বাংলা ব্যাকরণে তাকে বলা হয় কর্তৃকারক। যেমন: 'খুকি ঈদের সময় নতুন জামা পরবে।' এখানে খুকি পদটি কর্তৃকারক।
২. কর্মকারক: ক্রিয়ার বিষয়কে বলে কর্ম। বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে এ কর্মকে অর্থাৎ ক্রিয়ার বিষয়কে বোঝায়

তাকে বলে কর্মকারক। যেমন: ‘কালু দুলুকে জানে।’ এ বাক্যে ‘কালু কা’কে জানে?’ - ‘দুলুকে’। এ ক্ষেত্রে কালুর জানার বিষয় হচ্ছে দুলু। সুতরাং এ বাক্যে ‘দুলুকে’ পদটি হলো কর্মকারক আর ‘জানে’ ক্রিয়ার কর্ম।

৩. সম্প্রদান কারক: স্বত্বত্যাগ করে কিছু দান করাকে বলে সম্প্রদান। বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদে এরূপ দান ক্রিয়ার পাত্রকে বোঝায়, তাকে বলে সম্প্রদান কারক। দেখুন একটি বাক্য: ‘ভিখারীকে ভিক্ষা দাও।’ এখানে ‘ভিখারীকে’ সম্প্রদান কারক এবং ‘ভিক্ষা দাও’ মুখ্য কর্ম। নিজের স্বত্ব ত্যাগ করে অন্যকে দান করাই একমাত্র সম্প্রদান কারকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন: ‘মজুরকে বিনিময় দাও।’ এখানে মজুরকে তার কাজের বিনিময় দেওয়া বুঝাচ্ছে। সুতরাং ‘মজুরকে’ সম্প্রদান কারক হিসেবে ধরা যাবে না। এটা গৌণ কর্ম। বাংলায় ‘সম্প্রদান কারক’ রবীন্দ্রনাথসহ অনেক ভাষাবিদ স্বীকার করেন নি।

৪. করণ কারক: কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে করণ বলে। বাক্যে যে নাম পদে এ করণকে বোঝায়, তাকে বলে করণ কারক। যেমন এ বাক্যটি: ‘ছেলেরা ছুরিতে কলম কাটে।’ এখানে ‘ছেলেরা’ কর্তা ও ‘কাটে’ ক্রিয়া। ছেলেরা ছুরি দিয়ে কি কাটে - ‘কলম কাটে’। অর্থাৎ ছুরি হচ্ছে ‘কাটা’ ক্রিয়ার কারণ। সুতরাং ‘ছুরিতে’ পদটি করণ কারক।

৫. অপাদান কারক: যা থেকে কোনো কিছুর বিচ্যুতি, অপসারণ, নিবারণ, উৎপত্তি, গ্রহণ ইত্যাদি বোঝায়, ব্যাকরণে তাকে অপাদান বলে। বাক্যে যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ এরূপ অপাদানকে বোঝায়, তাকে অপাদান কারক বলে। ‘তিলে তেল হয়’ - বাক্যটিতে প্রশ্ন ওঠে কী থেকে তেল হয়? উ: তিল থেকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অপাদান কারক হলো ‘তিলে’ পদটি।

৬. অধিকরণ কারক: দেশ (স্থান, পাত্র), কাল ও বিষয় হলো ‘আধার’। যে আধারে ক্রিয়া বা ব্যাপার ঘটে, তাকে বলে সে ক্রিয়ার অধিকরণ। আর বাক্যে যে পদে এ ক্রিয়ার আধার বা অধিকরণকে বোঝায়, তাকে বলে অধিকরণ কারক। এ বাক্যটি বিবেচনা করুন: ‘ছেলেরা মাঠে ক্রিকেট খেলে।’ ছেলেরা কোথায় কোন্ জায়গায় বল খেলে? মাঠে, তাই না? সুতরাং মাঠ হলো খেলা ক্রিয়ার আধার। আর ‘মাঠে’ পদটি হলো অধিকরণ কারক।

এখন আমরা উপরে উল্লেখিত ৬টি কারকের ওপর আরো কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি। তৃতীয় বন্ধনীতে কারক পদটি দেওয়া হয়েছে।

১. কতৃকারক: পাখি সব করে রব। [পাখি] পাগলে কি না বলে। [পাগলে]

২. কর্মকারক: আমাদের একটি গল্প বলুন। [আমাদের] রেখো মা দাসেরে মনে। [দাসেরে]

৩. সম্প্রদান কারক: দিব তোমা শ্রদ্ধাভক্তি। [তোমা] সৎপাত্রে কন্যাদান কর। [সৎপাত্রে]

৪. করণ কারক: আমা তা’তে নাহি ভয়। [হ’তে] টাকায় কি না হয়। [টাকায়]

৫. অপাদান কারক: ধন থেকে সুখ হয় না। [ধন থেকে] এ বনে বাঘের ভয় নেই। [বাঘের]

৬. অধিকরণ কারক: হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে। [আজিকে] আমরা ঘর থেকে নদী দেখি। [থেকে]

উপসর্গ

বাংলায় বেশ কিছু অব্যয় শব্দ বা পদের পূর্বে ব্যবহার করে অর্থের প্রসার, সম্প্রসারণ, সঙ্কোচন ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। এগুলোকে উপসর্গ বলে।

(১) খাঁটি বাংলা উপসর্গ: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি (ইতো), উন, কদ্, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

উদাহরণ: অকেজো, অঘাচণ্ডী, অজমূর্খ, অনাচার, আধোয়া, আড়চোখ, আনমনা, আবছায়া, ইতোমধ্যে, ইতিহাস, উনুভাত, কদর্য, কুকথা, নিলাজ, পাতিহাঁস, বিভুঁই, ভরপেট, রামদা, সলাজ, সাজোয়ান, হাভাতে।

(২) তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ: প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব্, অনু, নির, দূর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অতি, অভি, অপি, উপ, আ।

উদাহরণ: প্রবোধ, পরাকাষ্ঠা, অপকীর্তি, সমুপস্থিত, নিখাত, অবগাহন, অনুজ, দুর্দম, বিশৃঙ্খল, অধিষ্ঠান, সুগম, উৎক্ষিপ্ত, পরিসীমা, প্রতিদ্বন্দ্বী, অভিব্যক্ত, অতিপ্রাকৃত, অপিনিহিত, উপবন, আকণ্ঠ।

(৩) বিদেশী উপসর্গ: (১) আরবি ও ফারসি: কার, দর, না, নিম, ফি, বদ, বে, বর, ব, কম, আম, খাস, লা, বাজে, গর।

উদাহরণ: কারসাজি, দরপাট্টা, নারাজ, নিমরাজি, ফি-মাস, বদমেজাজ, বেকসুর, বরদাশত, বদৌলত, কমজোর, আমমোক্তার, খাসদখল, লাওয়ারিশ, বাজে কথা, গরমিল।

(২) ইংরেজি: ফুল, হাফ, হেড, সাব।

উদাহরণ,: ফুল হাতা, ফুল সার্ট, ফুল প্যান্ট, হাফ-হাতা, হাফ-টাইম, হাফ-টিকিট, হাফ-স্কুল, হেড মাওলানা, হেড মাস্টার, হেড অফিস, সাবজজ, সাব-অফিস, সাবরেজিস্টার, সাব-ডিপুটি।

ক্রিয়ার কাল

ক্রিয়া অর্থে কোন রকম কাজ করা বা হওয়া বোঝায়। তবে ক্রিয়ার কাল বা সময় আছে। অর্থাৎ যে কোন কাজ হয় এখন করছি, না হয় ভবিষ্যতে করব, অথবা অতীতে করেছিলাম। বর্তমান, ভবিষ্যৎ কিংবা অতীত ছাড়া আর কোন কাল নেই। সুতরাং ক্রিয়ার কাল এই তিনটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমরা কাল সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরবো মাত্র।

(ক) বর্তমান কাল: সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এখানে 'হয়' ও 'যায়' বর্তমান কালে ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) অতীত কাল: আমরা গতকাল শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা দেখলাম। এখানে 'দেখলাম' শব্দটি অতীত কালের।

(গ) ভবিষ্যৎ কাল: আমরা সবাই মিলে কাজটা সেরে নেবো। এখানে 'নেবো' দ্বারা ভবিষ্যতের ক্রিয়া বুঝাচ্ছে।

উপরোক্ত তিনটি কালের মোট চারটি করে উপবিভাগ আছে। (ক) বর্তমান কাল: ১. সাধারণ বা নিত্যবর্তমান, ২. ঘটমান বর্তমান, ৩. পুরাঘটিত বর্তমান এবং ৪. বর্তমান অনুজ্ঞা।

উদাহরণ: ১. সাধারণ বা নিত্যবর্তমান: 'হেমন্তে শিশির ঝরে'। 'বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন।'- বাক্যটিতে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'করেছিলেন' না বলে 'করেন' বলায় বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপ, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।' - এ বাক্যটিও ঐতিহাসিক বর্তমান কালে লিখিত।

২. ঘটমান বর্তমান: 'মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে'। এ বাক্যে ক্রিয়া শুরু হয়েছে অতীতে এবং এখনও তা অব্যাহত আছে বুঝাচ্ছে। এটাই ঘটমান বর্তমান।

৩. পুরাঘটিত বর্তমান: 'সে কক্ষে ঢুকেছে'। এই বাক্যে এইমাত্র ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়েছে বুঝাচ্ছে। এর ফলে এটা এখনও বর্তমান। এরূপ ক্রিয়াই পুরাঘটিত বর্তমান কাল।

৪. বর্তমান অনুজ্ঞা: ১. এক্ষুণি চলে যাও! (আদেশ) ২. দয়া করে একটু ফুরসত দিন। (অনুরোধ) ৩. বড়দের শ্রদ্ধা করবে। (উপদেশ) ৪. আল্লাহ তোমাকে হায়াতে তায়্যিবাহ দিন। (প্রার্থনা) এ চার ধরনের বাক্য হলো বর্তমান অনুজ্ঞা।

(খ) অতীত কাল: ১. সাধারণ বা নিত্য অতীত, ২. ঘটমান অতীত, ৩. পুরাঘটিত অতীত ও ৪. নিত্যবৃত্ত অতীত।

উদাহরণ: ১. সাধারণ বা নিত্য অতীত: ইবনে সিনা ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। আমরা মাঠে খেলা দেখলাম। বাক্য দু'টোতে যথাক্রমে 'ছিলেন' ও 'দেখলাম' ক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলো নিত্য অতীত কালের বাক্য হিসাবে গণ্য হবে।

২. ঘটমান অতীত: তুমি তখন পড়ছিলে। আমি আপন মনে ভাবছিলাম। এ দু'টো বাক্যে যথাক্রমে 'পড়ছিলে' ও 'ভাবছিলাম' অতীতে ঘটমান ক্রিয়া বুঝাচ্ছে।

৩. পুরাঘটিত অতীত: আজ থেকে দশ বছর পূর্বে আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। এখানে 'গিয়েছিলাম' দ্বারা অতীতে সংঘটিত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেছে বুঝাচ্ছে। এটাই পুরাঘটিত অতীত।

৪. নিত্যবৃত্ত অতীত: তিনি প্রত্যেক রাতে জিকির করতেন। এখানে 'করতেন' দ্বারা ক্রিয়া ঘটতো বুঝাচ্ছে। এটাই নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

(খ) ভবিষ্যৎ কাল: ১. সাধারণ ভবিষ্যৎ, ২. ঘটমান ভবিষ্যৎ, ৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ও ৪. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

উদাহরণ: ১. সাধারণ ভবিষ্যৎ: আমরা সবাই মিলে কাজটি করবো। আমরা ওখানে যেয়ে আছরের নামায পড়বো। বাক্য দু'টোতে যথাক্রমে 'করবো' ও 'পড়বো' ক্রিয়া ব্যবহৃত হওয়ায় এগুলো সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বাক্য হিসাবে গণ্য হবে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ: তুমি না আসা পর্যন্ত বসে থাকবো। সে বিমানবন্দরে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। এ দু'টো বাক্যে যথাক্রমে 'বসে থাকবো' ও 'করতে থাকবে' ঘটমান ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বুঝাচ্ছে।

৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ: আমি হয়তো এ কথাটি বলে থাকবো। এ বাক্য অতীতে কিছু ঘটে থাকার সম্ভাবনা বুঝাচ্ছে। এরূপ বাক্যই পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ। তবে কেউ কেউ একে সন্দিগ্ধ অতীত বলেছেন। এরূপ বাক্যের আকৃতি ও রূপ ভবিষ্যৎবোধক হলেও অর্থের দিক দিয়ে অতীত কালের বোধ জন্মায়। এ কারণেই মতানৈক্য।

৪. ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা: তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে সরে যাবে। (আদেশ) কখনও গালাগালি করবে না। (উপদেশ) অনুগ্রহ করে এই ছেলেটির প্রতি খিয়াল রাখবেন। (অনুরোধ) আল্লাহ তোমার মঙ্গল করবেন। (প্রার্থনা) এই চারটি বাক্যই ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া বোঝায়। এগুলো ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।

প্রত্যয়

যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ শব্দ বা ধাতুর উত্তরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন: 'কৃ' একটি ধাতু। এর সঙ্গে তব্য যোগ করলে 'কর্তব্য' [কৃ + তব্য] শব্দটি গঠিত হয়। 'লঘু' একটি শব্দ। এর সঙ্গে 'তা' যুক্ত হলে 'লঘুতা' শব্দটি তৈরি হয়। সুতরাং 'তব্য' ও 'তা' প্রত্যয়।

প্রত্যয় দু'টি: ১. কৃৎ ও ২. তদ্ধিত।
কৃৎ প্রত্যয়: ধাতুর সঙ্গে যে প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। যেমন: গম + তব্য = গন্তব্য। কৃ + আনীয় = করণীয়। নাচ্ + অন = নাচন। লড় + আই = লড়াই। এই প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দটিকে কৃদন্ত শব্দ বলে।
তদ্ধিত প্রত্যয়: শব্দের সঙ্গে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন: বিষ্ণু + ষ্ণ = বৈষ্ণব। মনু + ষ্ণ = মনুষ্য। দীর্ঘ + তম = দীর্ঘতম। ঢাকা + আই = ঢাকাই। গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা। তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দকে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে।

সমাস

পরস্পরের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধযুক্ত দুই বা ততোধিক পদকে এক পদে পরিণত করাকে সমাস বলে। যেমন: বিদ্যা ও বুদ্ধি = বিদ্যাবুদ্ধি। বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন। চন্দ্র চূড়ায় = চন্দ্রচূড়া। দেশের বন্ধু = দেশবন্ধু। বঙ্গের বন্ধু = বঙ্গবন্ধু। মনে রাখা দরকার, পদগুলোর সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক না থাকলে সমাস হয় না। সমাসের মাধ্যমে গঠিত নতুন পদকে বলে সমস্ত পদ। আর যে একাধিক পদ মিলিত হয়ে সমাস হয় তাদেরকে বলে সমস্যমান পদ। মনে রাখা জরুরী, রচনার শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই সমাস। কাজেই শ্রুতিকটু কোন সমাসবদ্ধ পদ সৃষ্টি ও প্রয়োগ সমীচীন নয়।

সন্ধি ও সমাসের মধ্যে পার্থক্য: পরস্পর সন্নিহিত দু'টি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। অপরদিকে পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট একাধিক পদের একপদ পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন: রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র (সন্ধি)। ছায়া দ্বারা শীতল = ছায়াশীতল (সমাস)। আবিঃ + কার = আবিষ্কার (সন্ধি)। ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = ক্ষণস্থায়ী (সমাস)। লক্ষণীয়, সন্ধির সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নেই। অপরদিকে সমাসের প্রতিটি পদ একে অন্যের সঙ্গে অর্থের দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত।

সমাসের শ্রেণি: ব্যাকরণবিদরা সমাসের মোট ৬টি শ্রেণি সনাক্ত করেছেন। আমরা প্রতিটি উদাহরণসহ উল্লেখ করছি।
১. দ্বন্ধ সমাস: এই সমাসে প্রতিটি পদের অর্থ প্রধান থাকে। এরও আবার চারটি রূপ আছে। যথা: (ক) সাধারণ দ্বন্দ্ব সমাস: হাত ও পা = হাতপা, ভাই ও বোন = ভাইবোন, হিত ও অহিত = হিতাহিত, জামা ও খরচ = জমাখরচ, খড় ও কুটো = খড়কুটো, জায়া ও পতি = দম্পতি। (খ) সামর্থক দ্বন্দ্ব সমাস: কাজ ও কর্ম = কাজকর্ম, চিঠি ও পত্র = চিঠিপত্র, বাড়ি ও ঘর = বাড়িঘর, হাট ও বাজার = হাটবাজার, কাগজ + পত্র = কাগজপত্র। (গ) অলুক দ্বন্দ্ব সমাস: ঘরে ও বাইরে = ঘরেবাইরে, তেলে ও বেগুনে = তেলেবেগুনে, হাতে ও পায়ে = হাতেপায়ে, বনে ও বাদাড়ে = বনেবাদাড়ে, হাটে ও বাজারে = হাটেবাজারে। (ঘ) অর্থসূচক দ্বন্দ্ব সমাস: চাকর ও বাকর = চাকরবাকর, বাসন ও কোসন = বাসনকোসন, কাপড় ও চোপড় = কাপড়চোপড়, সোনা ও দানা = সোনাদানা। (ঙ) সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস: ডাল + ভাত = ডালভাত, অনুরূপ: বেচাকেনা, কান্নাহাসি, নদীনালা, মুড়িমুড়কি, দুধকলা, জীবনমৃত্যু, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ, আলো-অন্ধকার।
২. তৎপুরুষ সমাস: এই সমাসে আগের পদের অর্থ লোপ পায় এবং পরেরটির অর্থ প্রাধান্য লাভ করে। যেমন: চরণকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত, শোকের দ্বারা আকুল = শোকাকুল। এই সমাসেরও মোট ৬টি রূপ আছে। (ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস: চরণকে আশ্রিত = চরণাশ্রিত, হস্তকে গত = হস্তগত, পদকে আশ্রিত = পদাশ্রিত। (খ) তৃতীয়া তৎপুরুষ: মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন = মেঘাচ্ছন্ন, শোকের দ্বারা আকুল = শোকাকুল, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ = অগ্নিদগ্ধ, কীট দ্বারা দ্রষ্ট = কীটদ্রষ্ট, লাঠি দ্বারা খেলা = লাঠিখেলা। (গ) চতুর্থী তৎপুরুষ: জীয়ন উদ্দেশ্যে কাঠি = জীয়নকাঠি, শয়নের নিমিত্ত কক্ষ = শয়নকক্ষ, রান্নার নিমিত্ত ঘর = রান্নাঘর, বিয়ের নিমিত্তে পাগল = বিয়েপাগলা, ভিক্ষার নিমিত্তে ঝুলি = ভিক্ষাঝুলি, মরণের নিমিত্তে কান্না = মরণকান্না। (ঘ) পঞ্চমী তৎপুরুষ: পদ হতে চ্যুত = পদচ্যুত, সর্প হতে ভীত = সর্পভীত, শাপ হতে মুক্ত = শাপমুক্ত, আকাশ হতে বাণী = আকাশবাণী, দারিদ্র্য হতে মোচন = দারিদ্র্যমোচন, দুগ্ধ হতে জাত = দুগ্ধজাত, সমাজ হতে চ্যুত = সমাজচ্যুত, গ্রাম হতে ছাড়া = গ্রামছাড়া, দেশ হতে ছাড়া = দেশছাড়া, কলেজ থেকে ফেরৎ = কলেজফেরতা। (ঙ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ: গঙ্গার জল = গঙ্গাজল, রাজার কন্যা = রাজকন্যা, ঠাকুরের পো = ঠাকুরপো, মাতার স্নেহ = মাতৃস্নেহ, হংসের রাজা = রাজহংস, তরুর ছায়া = তরুছায়া, দূতের আবাস = দূতাবাস, কবির গুরু = কবিগুরু, কুকুরের ছানা = কুকুরছানা, ঠাকুরের ঝি = ঠাকুরঝি, বাঁদরের নাচ = বাঁদরনাচ, বটের তলা = বটতলা। লক্ষণীয়: কোনো ক্ষেত্রে সমাসের সময় পরের শব্দ আগে বসে। যথা: পথের রাজা = রাজপথ, পথের মাঝ = মাঝপথ, মিস্ত্রীদের রাজা = রাজমিস্ত্রী, দরিয়ার মাঝ = মাঝদরিয়া, হংসীদের রাণী = রাণীহংসী ইত্যাদি। (চ) সপ্তমী তৎপুরুষ: কার্যে দক্ষ = কার্যদক্ষ, পূর্বে ভূত = ভূতপূর্ব, জলে মগ্ন = জলমগ্ন, গাছে পাকা = গাছপাকা, অকালে বৃদ্ধ = অকালবৃদ্ধ, জ্ঞানে বৃদ্ধ = জ্ঞানবৃদ্ধ, মাতাতে ভক্তি = মাতৃভক্তি, পাপে আসক্ত = পাপাসক্ত, অরণ্যে বাস = অরণ্যবাস, ধ্যানে মগ্ন = ধ্যানমগ্ন, গোলায় ভরা = গোলাভরা, মরা মন = মনমরা, গলাতে ধাক্কা = গলাধাক্কা।
৩. কর্মধারয় সমাস: যে সমাস বিশেষণে ও বিশেষ্যে, বিশেষ্যে ও বিশেষণে কিংবা বিশেষণে ও বিশেষণে গঠিত হয় ও পরপদের অর্থ প্রাধান্য প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: মেজ যে মামা = মেজমামা, যিনি রাজা তিনিই

মহাশয় = রাজামহাশয়। এভাবে: নবজাতক, মহাপুরুষ, মহারাণী, প্রিয়দর্শন ইত্যাদি শব্দ কর্মধারয় সমাসভুক্ত শব্দাবলি।
৪. দ্বিগু সমাস: যে তৎপুরুষ সমাসের আগের পদে সংখ্যাবাচক বিশেষণ থাকে এবং পরপদের সঙ্গে অন্বিত হয়ে সমাহার বা সমষ্টি বোঝায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন: পঞ্চবটের সমাহার = পঞ্চবটী, ত্রিফলের সমাহার = ত্রিফলা, সপ্ত সুরের সমষ্টি = সপ্তসুর, সাত সমুদ্রের সমাহার = সাতসমুদ্দুর, শত অব্দের সমাহার = শতাব্দি। অনুরূপ: দ্বিপ্রহর, ত্রিমাত্রা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চনদ, ত্রিভুবন, পঞ্চপ্রদীপ, নবরত্ন, চতুরঙ্গ, ষড়রিপু, তেরনদী, পাঁচশালা, পাঁচফোড়ন, সাতঘাট, তেপান্তর, দোপায়া, দোচালা, তেপায়া, সেতার, সাতনলা ইত্যাদি দ্বিগু সমাসের অন্তর্ভূক্ত।
৫. বহুব্রীহি সমাস: যে সমাসে আগের বা পরপদের অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় আরেক অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: নেই লোভ যার = নির্লোভ, ভয় নাই যার = নির্ভয়, যার নাই পুত্র = অপুত্রক। অনুরূপ: দীর্ঘকায়, সুহৃৎ, নীলবসনা, নীলাম্বর, কীর্তিমান, বিগতযৌবনা, হীনপ্রভু, বেপরোয়া, ডাকাবুকো, মুখপোড়া, গোঁফখেজুরে ইত্যাদি হলো বহুব্রীহি সমাস।
৬. অব্যয়ীভাব সমাস: যে সমাসে আগের বা পরপদে অব্যয় থাকে এবং সে অব্যয়ের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন: কূলের সমীপে = উপকূল; অক্ষির সমীপে = প্রত্যক্ষ; দিন দিন = প্রতিদিন, রোজ রোজ = হররোজ, রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি, শক্তিকে অতিক্রম না করে = যথাশক্তি, মিলের অভব = গরমিল, বিঘ্নের অভাব = নির্বিঘ্ন, মরণ পর্যন্ত = আমরণ, পদ হতে মস্তক পর্যন্ত = আপাদমস্তক, প্রেরণার যোগ্য = অনুপ্রেরণা, ধ্যানের যোগ্য = অনুধ্যান, ধ্বনির সদৃশ = প্রতিধ্বনি, গ্রহের সদৃশ = উপগ্রহ, তাপের পশ্চাৎ = অনুতাপ, শোচনার পশ্চাৎ = অনুশোচনা, ফলের বিপরীত = প্রতিফল, দানের বিপরীত = প্রতিদান, ক্ষুদ্র অঙ্গ = প্রত্যঙ্গ, ক্ষুদ্র গ্রহ = উপগ্রহ, দ্বিজ চণ্ডাল সবাই = অদ্বিজচণ্ডাল, বালক বৃদ্ধ বনিতা সবাই = আবালবৃদ্ধবনিতা ইত্যাদি।

বাক্য প্রকরণ

বাক্য: পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কতগুলো পদ একত্র হয়ে একটি সম্পূর্ণ ও সঙ্গত অর্থ প্রকাশ করলে, তাকে বাক্য বলে। যেমন: গতকাল বাজারে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। এটা একটি বাক্য। শুধু 'গতকাল বাজারে' কিংবা 'গতকাল বাজারে প্রচুর মানুষের সমাগম' মনের ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। তাই 'হয়েছিল' এ সমাপিকা ক্রিয়াটি যোগ করলে মনের ভাব পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং এটি একটি বাক্য।

বাক্যরচনায় তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে: ১. যোগ্যতা, ২. আকাঙ্ক্ষা ও ৩. আসত্তি।
১. যোগ্যতা: যোগ্যতা না থাকলে বাক্য হবে অর্থহীন। আর অর্থহীন বাক্য সঠিকভাবে তৈরি হলেও তা বাক্য নয়। যেমন: রাতে সূর্যোদয় হয়। এখানে কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া উভয়টি থাকাসত্ত্বেও যোগ্যতা নেই। কারণ রাতে সূর্যোদয় হয় না।
২. আকাঙ্ক্ষা: ছেলেটির জন্য আমার চিন্তার শেষ নেই। এখানে আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়েছে। সুতরাং এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।
৩. আসত্তি: অর্থের সঙ্গতি বজায় রেখে ভাষার নিয়ম-নীতি অনুসারে পদগুলোকে পরপর সুবিন্যস্ত করার নাম আসত্তি। যদি বলা হয়: তিনি দেশের বিসর্জন জন্য ভোগসুখ করেন' তাহলে পদগুলো অর্থের সঙ্গতি রেখে সঠিকভাবে সাজানো হলো না। কিন্তু যদি বলা হয়: তিনি দেশের জন্য ভোগসুখ বিসর্জন করেন। তাহলে পদগুলো পরপর সুবিন্যস্ত হল এবং একটি বাক্যও হল।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

যে কোন বাক্যের দু'টি অংশ থাকে: ১. উদ্দেশ্য ও ২. বিধেয়। দরিদ্র ছেলেটি খুব কষ্টে লেখাপড়া করছে। এ বাক্যে উদ্দেশ্য হলো 'দরিদ্র ছেলেটি'। বিধেয় হলো 'খুব কষ্টে লেখাপড়া করছে'। উদ্দেশ্য অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো কর্তা। বিধেয় অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো সমাপিকা ক্রিয়া।

উক্তি পরিবর্তন

আমরা প্রায়শই অন্যের উক্তি তুলে ধরি। এভাবে উক্তি করার দু'টি পথ আছে। প্রথমটি হলো হুবহু উদ্ধৃতি যাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে। আর দ্বিতীয়টি নিজের ভাষায় বলা, যাকে পরোক্ষ উক্তি বলা হয়। নীশিতা বললো, 'মৃতরা কি কথা বলেরে!' -এটা প্রত্যক্ষ উক্তি। নীশিতা বললো যে, মৃতরা কথা বলে না। -এটা পরোক্ষ উক্তি। এভাবে মূল ভাব ঠিক রেখে বক্তব্যকে পরিবর্তন করার নাম উক্তি পরিবর্তন। উক্তি পরিবর্তন হলে উদ্ধৃতি চিহ্ন (' ' এবং " ") থাকে না। যে, ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় ব্যবহৃত হয়। কিছু উদাহরণ দেখি।
১. সে আমাকে বললো, "আমি ঢাকা যাচ্ছি।" [প্রত্যক্ষ] সে আমাকে বললো যে, সে ঢাকা যাচ্ছে। [পরোক্ষ]
২. রোগি বললো, "আমি এখন ভালো আছি"। [প্রত্যক্ষ] রোগি বললো যে, সে এখন সুস্থ আছে। [পরোক্ষ]
৩. সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, "আপনার বাড়ি কোথায়?" [প্রত্যক্ষ] সে আমাকে আমার বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা

করলো। [পরোক্ষ]

বিচরন (কম্পোজিশন)

(ক) প্রতিশব্দ বা একার্থক শব্দ (সিনোনিম্স)

ভাষাকে সুন্দর, মার্জিত, রসঘন ও বৈচিত্রপূর্ণ করার জন্য প্রতিশব্দের প্রয়োজন হয়। যেমন: অগ্নি একটি শব্দ। এর বেশ ক'টি প্রতিশব্দ আছে: বহ্নি, অনল, পাবক, হুতাশন, সর্বশুচি, আগুন, দহন, সর্বভূক, বৈশ্বান্বর, বিভাবসু ও শিখি। বিচরনের ধরণ বিবেচনায় সঠিক প্রতিশব্দ প্রয়োগ করলে লেখার মান বৃদ্ধি পাবে। আরো কয়েকটি শব্দের প্রতিশব্দসমূহ দেখুন।

অন্ধকার - তমিস্রা, তম, তিমির, আঁধার।
আকাশ - অম্বর, গগন, নভঃ, নভোমণ্ডল, ব্যোম, শূন্য, অন্তরীক্ষ।
গৃহ - ঘর, আবাস, আলয়, নিকেতন, নিলয়, ভবন, সদর, আঘার, বাটী, নিবাস।
পৃথিবী - ধরা, ধরিত্রী, ধরণী, মেদিনী, মহি, বসুন্ধরা, বসুধা, বসুমতী, অবনী, ক্ষিতি, ভূমি, ভূ।
বাতাস - অনিল, বায়ু, সমীরণ, হাওয়া, পবন।
রাত্রি - রজনী, শর্বরী, নিশী, যামিনী, বিভাবরী, পাড়, ধার।
তট - তরী, কূল, পুলিন, কিনারা, পার, ধার।
ঢেউ - তরঙ্গ, ঊর্মি, বীচি।
অঙ্গ - শরীর, গাত্র, দেহ, কায়, তনু, কলেবর।
জলা - পানি, বারি, জীবন, নীর, সলিল।
কন্যা - মেয়ে, দুহিতা, তনয়া, নন্দিনী, আত্মজা।

(খ) নানার্থক শব্দ

কিছু বাংলা শব্দ আছে, বিভিন্ন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর প্রয়োগ দ্বারা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। নিচে নানার্থক ক'টি শব্দ দেখুন।

জীবন - প্রাণ, পানি।
অর্থ - ধন, হেতু।
কর - কিরণ, রাজস্ব।
কাল - কুৎসিৎ, বধির।
ভাল - কপাল, মঙ্গল।
অম্বর - আকাশ, বস্ত্র।
প্রকৃতি - স্বভাব, চরিত্র।
মূল - আসল, গোড়া।
বর্ণ - রঙ, জাতি।

(গ) পদের বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ (ইডিওম্স)

শব্দ বা পদের সুনির্দিষ্ট অর্থকে বলে 'আক্ষরিক' অর্থ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই শব্দ তার আক্ষরিক অর্থ ব্যক্ত না করে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। শব্দের এরূপ বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ মূলত যে কোনো উন্নত ভাষামাত্রেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিচের উদাহরণগুলো দেখুন।

১. অতি আদর দিয়ে তুমি ছেলেটির 'মাথা' খেয়েছো। [সর্বনাশ বা ক্ষতি করা]
২. বিদ্বান ব্যক্তিরাই সমাজের 'মগজ'। (শ্রেষ্ঠ)
৩. এ ছেলে তোমার বংশের 'মুখ উজ্জ্বল' করবে। [গৌরবান্বিত]
৪. সমাজে একশ্রেণির লোক আছে যাদের কারো উন্নতি দেখলেই 'চোখ টাটায়'। [ঈর্ষা হওয়া]
৫. ঐ কেরানিটিই হলো বড় অফিসারের 'ডান হাত'। [নির্ভরশীল ব্যক্তি]
৬. যা বলছি 'কান পেতে' শোন। [মনোযোগ]
৭. আরে এ তো 'কথার কথা', এ নিয়ে এতো উত্তেজিত হওয়ার কী আছে? [তুচ্ছ কথা]
৮. ভদ্রলোক ঘটক, 'কথা বেচে' খান। [বাকপটুতাকে সম্বল করে]
৯. চোরটা পুলিশের ভয়ে 'গা ঢাকা' দিয়েছে। [আত্মগোপন]
১০. এতো খেটেও তার 'মন' পেলাম না। [ভালোবাসা]
১১. মেয়েটা অঙ্কে বড় 'কাঁচা'। [অপটু]

১২. তুমি কেনো এরূপ ‘কাঁচা’ কাজ করলে। [অনিপুণ]
১৩. ‘পাকা’ মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার। [বিচক্ষণ]
১৪. দামটা ‘পাকাপুক্ত’ করে নাও। [চূড়ান্ত]
১৫. ‘ছোট’ মুখে বড় কথা সাজে না। [অযোগ্য ব্যক্তির]
১৬. এতো ‘বড়’ গলা করে নিজের ছেলের প্রশংসা নাইবা করলে। [ঢাক পিটিয়ে]
১৭. ফকির ব্যাটার মনটা কিন্তু বিরাট ‘বড়’। [উদার]
১৮. তোমার মতো এমন ‘মোটা বুদ্ধির’ লোক আমি দেখি নি। [মূর্খ]
১৯. বঙ্গবন্ধু ‘প্রশস্ত’ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। [উদার]
২০. বড় সাহেব ‘মোটা’ বেতন পান। [অনেক টাকা মাইনে]

(ঘ) বাক্য সংকোচন

বাক্যে ভাব প্রকাশার্থে অনেক সময় আমরা অনেক শব্দ ব্যবহার করে থাকি। এতে অনাবশ্যক বাহূল্য, শ্রুতিকটুরতা, অনুধাবনে বিভ্রান্তি, গাম্ভীর্যতার অভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। মোটকথা রচনারীতির মধ্যে দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য লোপ পায়। এ থেকে নিষ্কৃতির পথ হলো বাক্যকে যথাসম্ভব সংকোচন করা।

বাক্য সংকোচনের বেশ ক’টি পথ রয়েছে। যেমন:
(১) সমাস প্রক্রিয়ার সাহায্যে: নাই অন্ত যার - অনন্ত।
(২) কৃদন্ত শব্দ গঠন করে: প্রতিশোধ লওয়ার ইচ্ছে - জিঘাংসা।
(৩) তদ্ধিতান্ত প্রক্রিয়া দ্বারা: যে বেশি কথা বলে - বাচাল।
(৪) বিশিষ্টার্থক শব্দ দ্বারা: ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় - ওষধি।

এবার কিছু উদাহরণ দেখুন:
অকালে জাত কুমড়া - অকালকুষ্মাণ্ড।
অকালে যে পেকে গিয়েছে - অকালপক্ক।
অক্ষির সম্মুখে - প্রত্যক্ষ, সম্মুখে।
অগ্রে জন্মেছে যে - অগ্রজ।
অতি অসাধারণ যে - অনন্যসাধারণ।
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা - অনুসন্ধিৎসা।
অনেকের মধ্যে একজন - অন্যতম।
আপনাকে যে ভুলে থাকে - আত্মভোলা।
আপনার রং লুকায় যে - বর্ণচোরা।
অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা করা - প্রত্যুদ্গমন।
কি করতে হবে তা যে বুঝে উঠতে পারে না - কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
কোন্টা দিক কোন্টা বিদিক এ জ্ঞান যার নেই - দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য।
খুব ঠাণ্ডাও নয়, খুব গরমও নয় - নাতিশীতোষ্ণ।
দিনে যে একবার মাত্র আহার করে - একাহারী।
নৌকা দ্বারা জীবন নির্বাহ করে যে - নাবিক।
পা হতে মাথা পর্যন্ত - আপাদমস্তক।
প্রথমে মধুর কিন্তু পরিণামে নয় - আপাতমধুর।
পরিণাম ভেবে যে কাজ করে না - অপরিণামদর্শী।
বিশ্ববাসীর জন্য হিত - বিশ্বজনীন।
বহু গৃহ হতে ভিক্ষা সংগ্রাহক - সাধুকারী।
ভোজন করার ইচ্ছা - বুভুক্ষ, ভোজনেচ্ছা।
ভবিষ্যতে কি হবে দেখে যে - পরিণামদর্শী।
ভদ্রলোকে যে রূপ ব্যবহার করেন - ভদ্রোচিত।
মামলা করতে অভ্যস্ত - মামলাবাজ।
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে - প্রত্যুৎপন্নমতি।
যার শোনামাত্র মুখস্ত হয় - শ্রুতিধর।
যার শ্রদ্ধা দূর হয়েছে - বীতশ্রদ্ধ।

যার তল স্পর্শ করা যায় না - অতলস্পর্শ।
যার চক্ষুলজ্জা নেই - চশমখোর।
যা আঘাত দ্বারা সহজে ভাঙ্গে না - ঘাতসহ।
যা বিনা যত্নে লাভ করা হয়েছে - অযত্নলব্ধ।
যা উচ্চারণ করা যায় না - অনুচ্চার্য।
যা পুনঃ পুনঃ জ্বলছে - জাজ্জ্বল্যমান।
যা প্রতিবিধান করা যায় না - অপ্রতিবিধেয়।
যে রমণী গোপনে প্রিয়জনের সাথে মিলিত হয় - অভিসারিণী।
যে রমণী অন্য কারো প্রতি আসক্ত হয় নি - অনন্যাসক্ত।
যে বন হিংস্র জন্তুতে ভরপুর - শ্বাপদসঙ্কুল।
যে পরে কি হবে তা বিবেচনা না করেই কাজ করে - অবিমৃশ্যকারী।
যে অনবরত রোদন করছে - রোরুদ্যমান।
যে বৃহৎ বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল হয় না - বনস্পতি।
যে কোনোও বিষয়ে স্পৃহা হারিয়েছে - বীতস্পৃহ।
যে নারী স্বয়ং পতিকে বরণ করে - স্বয়ংবরা।
যে সব বস্তু ভক্ষণ করে - সর্বভূক।
যে নারীর হাস্য পবিত্র - সুস্মিতা।
যিনি অপ্রিয় কথা বলে থাকেন - অপ্রিয়ভাষী।
যিনি বক্তৃতা দানে পটু - বাগ্মী।
হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত - আসমুদ্রহিমাচল।

কয়েকটি বিশেষ বস্তু বা ধ্বনির সংক্ষেপ: বাঘের চামড়া - কৃত্তি; হরিণের চামড়া - অজিন; অশ্বের ডাক - হ্রেষা; হস্তীর চিৎকার - বৃংহিত; কোকিলের ডাক - কেকা; নুপুরের ধ্বনি - রুনুঝুনু; বীণার ঝঙ্কার - নিক্বণ।

বাগ্‌ধারা

শব্দ বা পদের বিশিষ্ট প্রয়োগকেই বলা হয় বাগ্‌ধারা। এভাবে প্রয়োগ হলে নির্দিষ্ট শব্দটি তার আভিধানিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বাগ্‌ধারা বা বাগ্‌বিধি ভাষার সৌন্দর্য ও শক্তির পরিচায়ক। এক বা ততোধিক শব্দ যোগ করে কোন লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করাই বাগ্‌ধারার উদ্দেশ্য। বাংলা বাগ্‌ধারা বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। এর উপযুক্ত ব্যবহারে ভাষা সুন্দর, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়। প্রত্যেক ভাষায় লোক-ব্যবহারে ও বহুল প্রচলনকে ভিত্তি করে বাগ্‌ধারা গড়ে ওঠে। দেখুন বাগ্‌ধারা গঠনের কয়েকটি নমুনা:
১. আবদুল মুকিত সাহেব গ্রামের 'মাথা'। ২. এ 'কাঁচা' বয়সে দরবেশ সাজলে কেন? ৩. 'রিক্‌সা করে' চলে এসো। ৪. অন্যের 'গায়ে হাত' তোল না। ৫. দলিলখানা 'পাকা হাতের' লেখা। ৬. এতক্ষণে তার 'রাগ পড়েছে'। ৭. দস্যি ছেলেটাকে 'চোখে চোখে' রাখবে।
উপরোক্ত প্রতিটি বাক্যে কৌটের [' '] ভেতরে দেখানো শব্দগুলো তাদের আভিধানিক অর্থের ঊর্ধ্বে এসে ভাবকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। এরূপ পদ বা শব্দ প্রয়োগকেই বলে বাগ্‌ধারা গঠন।

ভাষায় বাগ্‌ধারার প্রয়োজনীয়তা: উপরোক্ত বক্যগুলো থেকেই অনুমান করা যায়, ভাষায় বাগ্‌ধারার প্রয়োজনীয়তা কতো বেশি। বাগ্‌ধারা প্রয়োগের কারণেই অর্থের দিক থেকে ভাষা বৈশিষ্ট্যময় হয়ে ওঠে। বাগ্‌ধারা ব্যবহারে শব্দের লক্ষণশক্তি ও ব্যঞ্জণশক্তি ভাষাকে চমৎকারিত্ব দিয়ে বৈচিত্রময় করে তোলে। এসব বিবেচনা করে বলা যায়, বাগ্‌ধারা ভাষার অমূল্য সম্পদ ও বৈশিষ্ট্য। নিচে বাগ্‌ধারার প্রয়োগসর্বস্ব কয়েকটি বাক্য তুলে ধরছি।
(ক) অরণ্যে রোদন [নিস্ফল আবেদন] - বড় সাহেবের কাছে অনেক কাকুতি করলাম; কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন।
(খ) গভীর পানির/জলের মাছ [কূটনীতিক] - আমাদের অফিসের ম্যানেজার সনদ বাবুর স্বরূপ চেনা দুঃসাধ্য, তিনি হচ্ছেন গভীর পানির মাছ।
(গ) অন্তর টিপুনি [গোপন আঘাত/পরামর্শ] - নিজের চতুর স্ত্রীর অন্তর টিপুনিতে এম.পি. সাহেব সাধারণের হিতকর হাতে হাত না দিয়ে বরং পিছিয়ে গেলেন।
(ঙ) অঞ্চল প্রভাব [স্ত্রীর প্রভাব] বেগম সাহেবাকে হাঁ করাতে পারলে সাহেব কখনও না করতে পারবেন না, এটা অঞ্চল প্রভাবের যুগ!
(চ) আঠারো মাসে বছর [দীর্ঘসূত্রতা] - চৌধুরী বাড়ির দুলালিদের তো 'আঠারো মাসে বছর' সকালে উঠে দাঁত মাজতেই

স্কুলের ঘণ্টা বাজে।
(ছ) আঁতে ঘা লাগছে [স্বার্থে আঘাত লাগা] - বেচারাকে আর অমন করে বলো না, আঁতে ঘা লাগছে।
(জ) আঁধার ঘরের মানিক [প্রিয় বস্তু] - ছেলেটি ছিলো বিধবা মায়ের আঁধার ঘরের মানিক, সেও শেষ পর্যন্ত মাকে ফাঁকি দিল।
(ঝ) আকাশ ভেঙ্গে পড়া [সহসা গুরুতর বিপদ আসা] - সর্বজনশ্রদ্ধেয় তার পীর সাহেবের মৃত্যুসংবাদে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।
(ঞ) আদুরে গোপাল [অতিরিক্ত আহ্লাদ] - ছেলেবেলা থেকেই ওকে অমন আদুরে গোপাল করে তুলেছ, এখন সামলাও।
(ট) আদার বেপারী [সামান্য বিষয়ে ব্যাপৃত ব্যক্তি] - আমি তো ভাই আদার বেপারী, দেশের আমদানি-রপ্তানি নীতি কি হল ওসব জাহাজের খবর রাখি না।
(ঠ) আকাশের চাঁদ [অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বস্তু] - অনেকদিন পরে বিদেশ থেকে আগত ছেলেকে দেখে মা যেনো আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।
(ড) এস্পার কি ওস্পার [যা হয় একটা মীমাংসা] কাশ্মীর সমস্যার একটা এস্পার কি ওস্পার না হওয়া পর্যন্ত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না।
(ঢ) কানে তুলা দেওয়া [কর্ণপাত না করা] - দেশের অভাব অভিযোগের বেলায় সব আমলেই সরকার কানে তুলা দিয়ে বসে থাকে।
(ণ) গোবরে পদ্মফুল - [নীচ বংশে মহৎ ব্যক্তি] - চামারের ঘরে এতো সুন্দরী মেয়ে, এ যে দেখছি গোবরে পদ্মফুল।
(ত) গৌরচন্দ্রিকা [দীর্ঘ ভূমিকা] - আরে, গৌরচন্দ্রিকা রেখে দাও, যা বলার বলে ফেল।
(থ) ছক্কা পাঞ্জা করা [লম্বা কথা বলা] - ছোট মুখে এত ছক্কা পাঞ্জা করা সাজে না।
(ধ) ঠেলার নাম বাবাজি [সঙ্কটে পড়লেই কাবু] - ঠেলার নাম বাবাজি কাকে বলে একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধে হানাদার খান সেনারা তা টের পেয়েছে।
(ন) হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা [গোপনীয়তা প্রকাশ] - আমার সঙ্গে বেশি বাহাদুরি করো না, হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব।

প্রবন্ধ রচনা

প্রবন্ধ শব্দটি সংস্কৃত। এর বিশ্লেষিত রূপ ‘প্রকৃষ্ট বন্ধন’। ভাব ও ভাষার বন্ধনে চিন্তাকে উৎকৃষ্ট পন্থায় বাঁধাকেই বলে প্রবন্ধ। কোন একটি বিষয় বিস্তারিতভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে বর্ণনার নাম প্রবন্ধ রচনা।

প্রবন্ধের শ্রেণি

প্রবন্ধের ধরন মোট তিনটি:
১. বিবৃতি বিষয়ক (ডিসস্ক্রিপটিক)।
২. ঘটনা বিষয়ক (ন্যারেটিভ)।
৩. নীতি ও ভাব বিষয়ক (রিফ্লেক্টিভ)।

১. বিবৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ: এতে থাকতে পারে কোন প্রাণী, বস্তু, উদ্ভিদ, স্থান ইত্যাদির বর্ণনা।
২. ঘটনা বিষয়ক প্রবন্ধ: এতে থাকতে পারে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, কারো জীবন ও কর্ম, উৎসব, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভ্রমণ কাহিনী, নৈসর্গিক বা সাময়িক ঘটনা ইত্যাদি।
৩. নীতি ও ভাব প্রকাশক: এরূপ প্রবন্ধে থাকতে পারে ধর্মোপদেশ, নীতি-নৈতিকতার বর্ণনা, মাতৃভক্তি, সময়ের মূল্য, দর্শন, সমাজচিন্তা ইত্যাদি।

নিয়মনীতি

সফল প্রবন্ধ রচনায় কিছু মৌলিক নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়। রচনা বলতে লেখকের নিজের ভাব ও বক্তব্যকে ভাষায় প্রকাশ করা বোঝায়। সুতরাং সফল প্রাবন্ধিকের প্রথম কাজ হলো বিষয়-ভাবনা। ভাবনা এলোমেলো হলে চলবে না। যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই।
ভাবনা যখন বিশুদ্ধ হবে, তখনই একে ভাষায় পরিবেশন করার চিন্তা আসবে। রচনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য এসে যেনো পুরো বিষয়কে লণ্ডভণ্ড না করে। এছাড়া তুচ্ছ কথার গুরুত্ব, পুনরুক্তি, অতিশয়োক্তি ইত্যাদি যাতে ঝোঁকে না বসে সেদিকেও খিয়াল রাখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: “অনর্থক কথা বাড়াইও না। অল্প কথায় কাজ হইলে বেশি কথার প্রয়োজন কি?” অবান্তর ও অতিরিক্ত কথা রচনায় দুই-ই বর্জনীয়।
বক্তব্য প্রকাশের ভাষা হবে সহজবোধ্য, প্রাঞ্জল, সাবলীল। পাঠক যেনো বিনা আয়াসে কথাগুলো ঠিক ঠিক বোঝাতে

পারেন। “প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ”, বঙ্কিমচন্দ্রের এ উক্তিটি স্মরণযোগ্য। ভাষায় জটিলতা, স্বচ্ছ সাবলীল না হওয়া, ভষার প্রসাদগুণের অভাব থাকলে পাঠকের নিকট সুখগ্রাহ্য, আগ্রহ ইত্যাদি জন্মাবে না। রচনা হবে ব্যর্থ। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন: “রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।”

মনে রাখা দরকার যে কোন রচনা শুদ্ধ হতে হবে। আর শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হলো সঠিক বানানরীতি অনুসরণ ও ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা। যে রচনাতে যথার্থই ভাষার রীতি ও ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, সে রচনার ভাষা অশুদ্ধ - এতে কোন সন্দেহ নেই।

ভাষার স্টাইল বা রীতিও নির্দিষ্ট করতে হবে। কোন্ স্টাইলে লিখব? সরল, গুরুগম্ভীর, ভারিক্কি চাল, না লঘু চালের ভাষায়। সার্থক ভাষাশিল্পী অবশ্য নিজের একক স্টাইলে লিখে থাকেন। শিক্ষার্থী হিসাবে আমাদেরকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশই মেনে নিলে ভালো হয়। তিনি লিখেছেন: “বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা লেখিতে চাও কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিস্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয় তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে: - বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে, যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে। ... তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করিবে।”

প্রবন্ধ রচনার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিয়ম-নীতি সর্বদাই অনুসরণ করা একান্ত জরুরী। এগুলো হলো:

১. বিষয়বস্তুকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা।

২. এদের একেকটি অংশকে সংকেতরূপে গ্রহণ করে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে [প্যারাগ্রাফ] নাতিদীর্ঘ আকারে প্রকাশ করা।

৩. প্রথমে ভূমিকা, মাঝখানে মূল বক্তব্য এবং শেষে উপসংহার থাকবে। উপসংহারে লেখকের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত হবে।

৪. ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে সঙ্গতি ও ধারাবাহিকতা থাকবে। প্রবন্ধ রচনায় এ জিনিসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৫. ভাষা হবে সহজ ও সরল। বক্তব্যের স্পষ্টতা হতে হবে সাবলীল।

৬. সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

বাংলা ব্যাকরণের ওপর সংক্ষিপ্ত এ আলোচনার শেষ এখানেই। সবাই ভালো থাকুন, ভালো লিখুন, শুদ্ধ লিখুন।

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ
আলী সেন্টার, সুবিদবাজার, সিলেট, বাংলাদেশ।
২/২৩/২০১৭
engineerazizulbari@gmail.com